



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 270 - 278

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

আবু ইসহাকের ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ : নিম্নবর্গ জীবনের আখ্যান

ড. সুবীর বসাক

সহকারী অধ্যাপক, অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, অমরপুর, ত্রিপুরা

Email ID : subir.bangla@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Famine, Riots,
Partition,
Superstitions and
belief, Polygamy and
divorce,
Marginalized people,
Muslim family.

Abstract

Abu Ishaq is a renowned Bangladeshi novelist. His first and timeless novel is ‘Surya-Dighal Bari’. The time period of the novel’s setting extends from the famine of 1943 to the immediate after of independence. As a result, the famine of 1943, the riots of 1946, the impact of independence and partition of 1947 naturally flow through the novel like a torrent. The author, capturing that time of burning, has painted the life of the helpless lower-class people of Bangladesh with utmost compassion. At the center of the novel is the difficult struggle for survival of a selfless family caught in the famine and riots. This novel is about people who leave their villages for the city in the famine of 1943 and return to the village after a terrifying experience of despair. In the Muslim family of the lower class, witch doctors, brooms, spells, and bewitchment are everyday occurrences. That picture has been painted through various incidents in ‘Surya-Dighal Bari’. The topic of the illiterate and lower-class people’s superstitions and beliefs, and belief in evil spirits, comes up in the novel in various ways. In parallel, various evils flowing in the public mind, stories, verses, rhymes, riddles, etc. flow into their daily conversations and behavior. Various elements of folk culture have come up in various ways. Polygamy and divorce are a big problem in the life of the lower-class Muslims, and Abu Ishaq has also highlighted that problem with great compassion in his novel. Abu Ishaq’s ‘Surya-Dighal Bari’ has become a living history of what created deep wounds in the minds of the people of Bangladesh in the past. The novel deals with the issue of the country’s independence and its impact on the lower-class Muslim community of Bangladesh. The economic crisis and struggle of lower-class Muslim families, inhumane practices like polygamy and divorce, the veiling system, religious discipline, the lifeless religious practices of religious merchants and the lust for women, the blind faith, reformation, and worldly customs of marginalized people - all of this together makes the novel a realistic biography of a lower-class marginalized Muslim family.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে আবু ইসহাকের ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। উভয় বাংলার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ একটি। উপন্যাসটি বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রটি নানা আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ (১৯৫৫) এবং ‘পদ্মার পলিদ্বীপ’ (১৯৮৫) উপন্যাস দুটি শিল্পী ইসহাকের অনন্যতর পরিচয় বহন করে।

‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ উপন্যাসটির পটভূমিতে রয়েছে ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭-এর দেশভাগের প্রসঙ্গ। সেই পটভূমিতে একটি নিম্নবর্ণের মুসলমান পরিবারের জীবনচিত্র উপন্যাসটির মূল উপজীব্য বিষয়। ১৩৫০-এর মন্বন্তরে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাত্রা এবং হতাশাগ্রস্ত বীভৎস অভিজ্ঞতার পর আবার গ্রামে ফিরে আসা মানুষগুলিকে নিয়ে এই উপন্যাস। ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশের মানুষের কয়েক পুরুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। যে বীভৎস আকার নিয়ে তার আবির্ভাব ঘটেছিল, দীর্ঘদিন সেই প্রবহমানতাই সে বজায় রেখেছে। এই রকম যন্ত্রণাদঙ্ক সময়ের ক্ষুধার্ত পীড়িত নিম্নবর্ণের মুসলিম জীবনের আলেখ্য আবু ইসহাকের ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’।

‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’র সময়কাল ১৩৫০-এর অনতিকাল পর থেকে স্বাধীনতা অনতিকাল উত্তর। গল্পের কাহিনিতে রয়েছে নিম্নবর্ণের এক মুসলমান পরিবারের কথা। জয়গুন ও শফীর মা দুর্ভিক্ষের জ্বালায় সর্বশান্ত হয়ে গ্রামে ফেরে। ভিটেমাটিহীন কপদক অবস্থায় আশ্রয় নেয় সূর্য-দীঘল বাড়ীতে। সেখানকার জঙ্গল পরিষ্কার করে মাথা গোঁজার আশ্রয় তৈরী করে নেয় তারা। জয়গুন স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত। অভাবের দিনে করিমবকশ বিনা কারণে জয়গুনকে পরিত্যাগ করেছে। তাই নিরুপায় জয়গুন উত্তর থেকে কম দামে চাল কিনে এনে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করে কোনো প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করে। চাল-চুলোহীন এই হা-ভাতে মুসলমান পরিবারটিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের নিম্নবর্ণের মুসলমান জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’র পাতায়।

নিম্নবর্ণের মুসলিম পরিবারে ওঝা-কবিরাজ, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-বশীকরণ ইত্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। স্বাভাবিক ভাবেই নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই চিত্র আঁকা হয়েছে ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’তে। প্রথম যে ঘটনার পরিচয় আমরা পাই, তা হল জোবেদ আলী কর্তৃক সূর্য-দীঘল বাড়ীর চার সীমানায় পাহারাদার বসানো। জোবেদ আলী সূর্য-দীঘল বাড়ীর চার সীমানায় চারটি তাবিজ পুঁতে অপশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা সদর্পে ঘোষণা করে। জয়গুন-শফীর মা-ও বিশ্বাসে ভর করে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বাস করা শুরু করে সূর্য-দীঘল বাড়ীতে। দ্বিতীয় যে ঘটনায় ওঝা-কবিরাজের সাক্ষাৎ পাই তা হল, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত কাসুর চিকিৎসার সময়। কাসু ভয় পেয়ে জ্বরে আক্রান্ত হলে করিমবকশ কাসুকে ডাক্তার না দেখিয়ে ফকির পাগলা দিদারকে দেখানো শুরু করে। ফকিরের তেল পড়া, ঝাড়-ফুঁক, তুঁক-তাক কাণ্ডকারখানার নাটকীয় পরিচয় পাই আমরা এই পর্বে। নিম্নবর্ণের মুসলমান পরিবারের অন্তরে এই পীড়-ফকিরদের কতটা প্রভাব তার পরিচয় আমরা পাই ইসহাকের একটি চিহ্নায়ক খচিত বাচনে, -

“গ্রামে তাই ফকির-কবরেজদের পসার বেশী। ওষুধ মেশানো পানির চেয়ে বেশী কদর মন্ত্রপুত পানির।”^১

উপন্যাসটিতে জোবেদ আলী ফকিরের সর্বশেষ আরেকটি কর্মের পরিচয় রয়েছে - করিমবকশকে মন্ত্রপুত গজাল দেওয়া। গদু প্রধানের চক্রান্তে সূর্য-দীঘল বাড়ীতে ফের ঢিল পড়তে শুরু করেছে। পরিত্যক্ত জয়গুন ও সন্তানদের রক্ষার জন্য করিমবকশ ফকিরের পরামর্শে মন্ত্রপুত গজাল সূর্য-দীঘল বাড়ীর চার সীমানায় পুঁতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ভূত-প্রেত-অপশক্তিতে মানুষের বিশ্বাসের তল অনেক গভীরে। আর অশিক্ষিত-নিম্নবর্ণের মানুষের ক্ষেত্রে তো কোনো কথাই নেই। তাদের রক্তে-রক্তে মিশে আছে অপশক্তিতে বিশ্বাস। আবু ইসহাকের ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’তে এ-রকম অনেকগুলি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিসরে। প্রথম পরিচয় পাচ্ছি - গ্রামের মানুষের ধারণা সূর্য-দীঘল বাড়ীতে মানুষ বাস করতে পারে না। পূর্ব-পশ্চিম অর্থাৎ সূর্যের উদয়-অস্ত প্রসারিত বাড়ীর নাম সূর্য-দীঘল বাড়ী। কোনো এক সময় খাদেম নামের কেউ একজন সেই বাড়ীতে বাস করতো। এক বর্ষায় তার দুটি সন্তানের মৃত্যু ঘটে। তাছাড়া সূর্য-দীঘল বাড়ীকে কেন্দ্র করে আরো নানান ভৌতিক জনশ্রুতি গড়ে ওঠে মানুষের কল্পনায়। তাদের বিশ্বাস সূর্য-দীঘল বাড়ীর বাঁশঝাড়, তেতুল, শিমূল, গাবগাছগুলি ভূতের আড্ডার জায়গা। ফলতঃ সূর্য-দীঘল বাড়ীর চৌহদ্দির সীমানাতেও কেউ ঘেঁসে না সন্ধ্যার পর।

এরকম অপশক্তিতে বিশ্বাস পাই, হাসুর কিছু কথায়। বেশী রাত হয়ে যাওয়ায় হাসু একদিন কাজের থেকে বাড়ী ফিরতে পারে না। তাকে বাধ্য হয়ে রাত কাটাতে হয় স্টেশন চত্বরে। জনমানবহীন সেই স্টেশন চত্বরে হাসুর রাত কাটানোর অভিজ্ঞতায় অতিপ্রাকৃতের কিছু পরিচয় পাই। তার কথায়, -

“কী ঘুডঘুড্যা আন্ধার গো মা! একটা মাইনুষের আলয় নাই। এইহানে ওইহানে এটুটু পরে পরে কীয়ের জানি খচ-খচানি। বিলের মধ্যে কীয়ের যেন বাতি - এই জ্বলে, এই আবার নিবে। আবার কীয়ের বিলাপ হুলাম। মাইনুষের মতন কান্দে। ডরে আমি এক্কেরে মাটির লগে মিশ্যা আছিলাম। এই আলোগুলা অলৈয়া, না মা?”^২

কাসুকে করিমবকশের ভয় দেখানোর মধ্যেও আছে অপশক্তির প্রসঙ্গ। কাসুকে গৃহবন্দী করে রাখার জন্য করিমবকশ কৃত্রিম ভাবে ভয় দেখায়। সেই ভয় শিশু মনে অনেকখানি আঘাত হানে। ধীরে ধীরে কাসু অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার উপর করিমবকশের মুখে শোনা গোঙাবুড়ি ও ছালাবুড়ির প্রসঙ্গ তাকে ক্রমশ সন্ত্রস্ত করে তোলে -

“গোঙাবুড়ির গোঙানি, ছালাবুড়ির ছালা, তাদের নখর ও দাতের এলোমেলো কল্লনা কাসুকে সবসময় সন্ত্রস্ত করে রাখে। কোনো ঠুং ঠাং শব্দ শুনলেই সে ভয়ে অস্থির হয়। রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে চিৎকার করে ওঠে।”^৩

ভূত-প্রেত ইত্যাদি অতিপ্রাকৃত প্রসঙ্গ যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে ভূত তাড়ানোর বিচিত্র তামাশার চিত্রও। কখনো অসুস্থ কাসুর নাকে পোড়া সলতে ঢুকিয়ে বা নিজের সাকরদদের উপর সাজানো চালান দিয়ে ভূত তাড়ানোর মন্ত্র পড়তে দেখা যায় দিদার বকসকে। এমনই তার ক্ষমতা যে শত শত ভূতকে নিজের বিছানার তলে বোতলবন্দি করে রাখতেও পারে। দিদার বকসের এই আজগুবি কাণ্ডকারখানার প্রতি পূর্ণ আস্থাও পোষণ করতে দেখা যায় করিমবকশের মতো মানুষদের।

এতো গেল অতিপ্রাকৃতের প্রতি মানুষের আস্থার চিত্র। এরপর আছে লৌকিক সংস্কার-বিশ্বাসের প্রসঙ্গ। সমান্তরালভাবে জনমানসে প্রবাহিত বিভিন্ন কু-সংস্কার। অতি অল্প পরিসরে জনমানসে সেই প্রবাহমান সংস্কারের ছবি ফুটে উঠতে দেখি আবু ইসহাকের ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’তে। কয়েকটি চিত্র এখানে তুলে ধরা হল -

১) “বিছমিল্লা বুইল্যা মোখে দে। দেখবি এই দুগুগায়ই প্যাট ভইর্যা যাইব।”^৪ (ভাত কম থাকার কারণে মায়মুনের উদ্দেশ্যে জয়গুন)

২) “ছেলেকে হুকুম দেয় কয়েকটা কুমড়ো পাতা তুলে আনতে। নিজে সে যায় না। বাচ্চাকাচ্চার মা; রাত-বিরাতে গাছের ফল-পাতা ছিঁড়তে নেই।”^৫ (জয়গুন সম্পর্কে)

৩) “যেই আন্ডাটা লক্ষা, হেইডায় অইব আঁসা, আর যেইডা গোল হেইডায় অইব আঁসা।”^৬ (হাঁসের ডিম বসানো প্রসঙ্গে শফীর মা)

৪) “কী জানি এইর’ম অইতাছে ক্যান। তোরা কাপড় উলটা কইর্যা পিন্দা নে দেহি কী অয়।”^৭ (মাছ না পেয়ে করিমবকশ)

৫) “দহিন মুহী কাইত অইয়া ওঠলে আকাল অইবই। বুড়া-বুড়ির কাছে হুনাছি, দহীন মুহী কাইত অইয়া চান যদি সমুন্দরের ওপরে নজর দেয়, তয় বান ডাইক্যা দ্যাশ-দুইন্যাই তলাইয়া যায়।”^৮ (রমজানের চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে শফীর মা)

৬) “একটা রোজার জন্য আশি হোকবা দোখজের আগুনে পুড়তে হবে। এক একটা হোকবা ইহলোকের আশি বছরের সমান।”^৯ (রোজা ভাঙ্গার কারণে জয়গুনের স্বগতোক্তি)

৭) “তোর বড়শিতে ক্যার জানি মোখ লাগছে রে! কেও নষ্ট না করলে এমুন অয়? আমার মনে অয়, কেও ডিঙ্গাইয়া গেছে তোরা ছিপ। হেই-এর লাইগ্যা মাছ ওঠতে আছে না।”^{১০} (বড়শীতে মাছ না ওঠায় মায়মুনের উদ্দেশ্যে শফী)

৮) “সোনার-রূপার পানি দিয়া গোসল করাইয়া তারপর ঘরে লইয়া যা।”^{১১} (হাসুর বসন্ত হয়ে থাকতে পারে এই আশঙ্কায় জয়গুনের উদ্দেশ্যে শফীর মা)

নিম্নবর্ণের মুসলমান জনজীবনে দৈনন্দিন কথা-বার্তায়, ব্যবহার-আচরণে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয় গল্প, কিসসা, শ্লোক, ছড়া, ধাঁধা ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান। আবু ইসহাকের ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ উপন্যাসে ব্যবহৃত লোকসংস্কৃতির কিছু উপাদান এখানে তুলে ধরা হল -

- ১) ছড়া- “বড়শি পুড়ি, বড়শি পুড়ি,
ট্যারা পড়শির মুখ পুড়ি
মাছ ধরমু দুই কাড়ি।”^{১২}
- ২) ধাঁধা- “মাছ করে ঝক ঝক ছোট্ট এক ঝিলে
একটা মাছে টিপ দিলে বেবাকগুলো মিলে।”^{১৩}
- ৩) বাগধারা- “চান্দের মধ্যে ফান্দের কথা।”^{১৪}
- ৪) প্রবাদ- “পৌষের হিমে ভীম দমন,
মাঘের শীতে বাঘের মরণ।”^{১৫}
- ৫) গ্রাম্যগীত- “আত আছিল, পাও আছিল,
আছিল গায়ের জোর,
আবাগী মরল ওরে
বন্দ কইর্যা দোর।”^{১৬}
- ৬) মন্ত্র পড়া- “খাটো কাপড় উলট বেশে
বান মারলাম হেসে হেসে।
... ..
আগে ভাগে ভূত পেরেত
জিন ভাগে শেষে।”^{১৭}

বহুবিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক দেওয়া) নিম্নবর্ণের মুসলমান জীবনে এক বড় সমস্যা। আবু ইসহাক অত্যন্ত দরদের সাথেই এই সমস্যাটিকে তুলে ধরেছেন তাঁর ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’ উপন্যাসে। উপন্যাসটিতে দেখতে পাই করিমবকশ একদিন উত্তেজনার মাথায় তার প্রথমা স্ত্রী মেহেরুনকে হত্যা করেছিল। তারপর তিনি নিকা করেন জয়গুনকে। জয়গুনের উপরেও নানা ভাবে চলতে থাকে করিমবকশের স্বভাবজাত অত্যাচার। শেষে যখন দুর্ভিক্ষ এসে হাজির হয়, সেই অভাবের দিনগুলিতে করিমবকশ বিনাকারণে জয়গুনকে তালাক দেয়। সেই সাথে পুত্রসন্তানটিকে নিজের কাছে রেখে কন্যা সন্তানটিকে জয়গুনকে ঠেলে দেয়। এরপর করিমবকশ নিকা করে অঞ্জুমানকে। এইভাবে করিমবকশের জীবনে নিকা এবং তালাক চলতে থাকে সমান্তরাল ভাবে। এমনকি উপন্যাসের শেষপর্বে করিমবকশ যখন নিজের ভুল বুঝতে পারে, তখন আবার সে জয়গুনকে ফিরে পেতে চায়। এর জন্যে যদি প্রয়োজন হয় তো অঞ্জুমানকে তালাক দিতেও তিনি রাজি। তিনি বলেন, -

“যদি একবার মোখ ফুইট্যা কও ‘সতিনের ঘর করতাম না’ তয় ফুলির মা-রে রাইত পোয়াইলেই খেদাইয়া দিতে পারি।”^{১৮}

নিম্নবর্ণের মুসলমান জীবনে যেন নিকা করা এবং তালাক দেওয়াটা কোনো ব্যাপারই না। যখন ইচ্ছা করা যায়, যখন ইচ্ছা ছাড়া যায়। পচনধরা সমাজের সেই ছবি তুলে ধরেছেন, ইসহাক তাঁর লেখনিতে। উপন্যাসের অন্যত্র দেখতে পাই, গদু প্রধানের অনেকগুলি বিবি থাকা সত্ত্বেও সে আবার জয়গুনকে বিবাহ করতে চায়। এছাড়া ওসমান মিঞার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর, সে বিবাহ করে মায়মুন কে। কিন্তু বিবাহের পর যখন বুঝতে পারে মায়মুন অত্যধিক ছোট, আরো তিন চার

বছর না গেলে সংসারের উপযুক্ত হবে না; তখনই সে মায়মুনকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়। সোলেমান খাঁর উচ্চারণ

“ওরে ওর মা-র কাছেই পাড়াইয়া দাও। আমি আবার ওসমানের শাদি দিমু।”^{১৯}

এইভাবে উপন্যাসের পরতে পরতে আবু ইসহাক মুসলমান জীবনের বহুবিবাহ ও তালাক সমস্যাটিকে তুলে ধরেছেন।

যুগে যুগে কালে কালে ধর্মীয় অনুশাসনের ইমারতে চাপা পড়ে গেছে কত শত নিষ্পাপ-তাজা প্রাণ। সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের চাকায় পিঠে গেছে সেই সমস্ত প্রাণের দীপশিখাটি। তবুও ধর্মীয় অনুশাসন এতটুকুও শিথিল হয়নি। মুসলিম নিম্নবর্ণের জীবনে এই সমস্যা আরো বেশী উজ্জ্বল। বহুবিবাহ ও তালাক প্রথা যেমন ধর্মীয় অনুশাসনের প্রসঙ্গে এসেছে, তেমনি এসেছে পর্দা প্রথার কথাও। জয়গুন স্বামী পরিত্যক্তা হবার পরেও ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে দীর্ঘদিন ঘরের থেকে বের হয়নি। অনাহারে-অর্ধাহারে দিন অতিক্রান্ত করেছিল। শেষ পর্যন্ত কোলের শিশুটি যখন দুধের অভাবে মারা যায় তখন জয়গুন অন্যান্য শিশুগুলিকে বাঁচানোর তাগিদে ঘর থেকে বের হয়। অনেক গাছতলায়-লঙ্গরখানায় দিন কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নেয় সূর্য-দীঘল বাড়ীতে। উত্তর থেকে কম দামে চাল কিনে গ্রামে গ্রামে চাল বিক্রি করে সে হাসু ও মায়মুনকে আধপেটা খাইয়ে মানুষ করছিল। এজন্য গ্রামের মৌলবীদের কাছ থেকে তাকে কম অপমান সহ্য করতে হয়নি। তার দেওয়া এক হালি আন্ডা মসজিদের মৌলবী সাহেব ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারণ জয়গুনের অপরাধ সে বাড়ির বাইরে বের হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গদু প্রধানের চক্রান্তে মায়মুনের বিয়ের সময়, জয়গুনকে তোবা করতে হয়। তোবা করার অর্থ হলো ঘরে বসে থাকা। প্রথম প্রথম জয়গুন তোবা করতে রাজি হয়নি, কারণ সে জানে তোবা করার মানে হলো ঘরে হাত পা গুটিয়ে না খেয়ে মরা। কিন্তু গদু প্রধান ও মৌলবী সাহেবের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয় জয়গুনকে। কারণ তোবা না হলে মায়মুনের বিয়ে সম্ভব নয়, মৌলবীসাহেব কলমা পড়বেন না। তোবা করার আগে পর্যন্ত মৌলবীর কাছে জয়গুন ছিল রাস্তার কুকুরের সমান। কিন্তু তোবা করা অর্থাৎ অর্থহীন কিছু বাক্য উচ্চারণ করার মধ্য দিয়েই জয়গুনের সমস্ত দোষ ঢাকা পড়ে। তাই তোবা পরবর্তী সময়ে জয়গুনের হাতে খেতে আর কারো কোনো আপত্তি নেই। ধর্মীয় অনুশাসন কীভাবে মানুষকে গ্রাস করে আবু ইসহাক অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই সে কথা লিপিবদ্ধ করেছেন ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’র পাতায়।

দরিদ্রতার এক মহৎ গুন আছে। সে সমস্ত কিছু মধ্য থেকে প্রকৃত মানুষটিকে বের করে আনে। জয়গুনও ক্ষুধার জ্বালায় সমস্ত কিছু ভুলে যায়। তোবা করে মাস ছ’য়েক ঘরে বসে থাকার ফলে জয়গুনের সংসারে দেখা যায় প্রচণ্ড অগ্নাভাব। হাসু যতটুকু রোজগার করে তা দিয়ে তিনটি মানুষের একবেলা খাবারও জোটে না। তার উপর কাসু অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার চিকিৎসার জন্যও বেশ কিছু খরচ হয়। একসময় মাতৃহের টানে কাসু করিমবকশকে ছেড়ে জয়গুনের কাছে এসে পড়ে। জয়গুন জানে কাসুকে সময় মতো দুটো খেতে দিতে না পারলে, তার মাতৃহের কোনো মূল্যই থাকবে না কাসুর কাছে। তাই সন্তানদের কাছে দু’মুঠো অন্ন তুলে দিতে গিয়ে সে ভুলে যায় ধর্মীয় অনুশাসনকে। তার কাছে জীবনধারণ তাই হয়ে যায় প্রথম শর্ত। ধর্ম তার পরে। যে ধর্ম জীবনকে রুদ্ধ করতে চায়, সেই ধর্মকে দূরে ছুঁড়ে দিতে তাই জয়গুনের কোনো দ্বিধা হয়নি। গ্রাম্য একটি গীতের কিছু অংশ তাই জয়গুনের কাছে নতুন তাৎপর্যে ধরা দেয় -

“আত আছিল, পাও আছিল,
আছিল গায়ের জোর,
আবাগী মরল ওরে
বন্দ কইর্যা দোর।”

তাই জয়গুন বেড়িয়ে পরে ফতুল্লার ধান কলে কাজ করবার জন্যে। কারণ সে বুঝেছে, -

“জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূল মন্ত্র। জীবন রক্ষা করতে ধর্মের যে কোনো অপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সে প্রস্তুত। উদরের আগুন নেবাতো দোখজের আগুনেও ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নেই।”^{২০}

কিন্তু ধর্মের ধ্বজাধারী সংস্কারবদ্ধ কিছু মানুষ যারা ধর্মের প্রকৃত রূপ অনুধাবন করতে পারে না; শুধুমাত্র সংস্কারকে মেনে চলে, সেই সমস্ত মানুষদের দ্বারাই প্রকৃত ধর্ম বার বার ত্রুশবিদ্ধ। গদু প্রধান এই রকম একটি চরিত্র। সে জয়গুনের বাইরে যাওয়া কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারেনি। অবশ্য তার পেছনে গদু প্রধানের আলাদা উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। জয়গুনকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে রাজি করাতে না পেরে তাকে শিক্ষা দেবার জন্য উপায় খুঁজতে থাকে গদু প্রধান। রাতের বেলায় ঢিল ছুড়তে থাকে সূর্য-দীঘল বাড়ীতে। তাতে গ্রামবাসীদের মনে হয়, -

“সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভূত খেপছে, আর উফায় নাই।”^{২১}

জয়গুন-শফীর মা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সারারাত আল্লার নাম জপতে থাকে। অন্যদিকে শেষপর্যন্ত করিমবকশ নিজের ভুল বুঝতে পারে। বিনা কারণে যে একদিন জয়গুনকে পরিত্যাগ করেছিল, সেই আজ বিপদের দিনে জয়গুনকে বাঁচাতে আসে। সূর্য-দীঘল বাড়ীকে ভূতের হাত থেকে রক্ষা করতে ফকিরের মন্ত্রপুত চারটি গজাল আমাবস্যার রাতে বাড়ীর চারকোণায় পুঁততে শুরু করে। একসময় তার নজরে পড়ে যায় গদু প্রধানের কারসাজি। কিন্তু গদুপ্রধান ও তার সাকরেদদের কাছ থেকে সে আর রক্ষা পায় না। পরদিন সকালে দেখা যায় -

“সূর্য-দীঘল বাড়ীর তালগাছের তলায় করিমবকশের মৃতদেহ টান হয়ে পড়ে আছে। আশ-পাশ গ্রামের লোক ছুটে আসে দেখতে। মৃতের শরীরে কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। সকলেই একমত - সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভূত তার গলা টিপে মেরেছে।”^{২২}

এইভাবে ধর্মের পান্ডাদের হাতে একটি জীবিত প্রাণ খসে পড়ে। জয়গুনকে আবাবারো স্বপরিবারে গৃহ ত্যাগ করতে হয় - অনন্ত পৃথিবীতে একটু আশ্রয় খোঁজার আশায়। আর ঔপোন্যাসিকের কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি অত্যন্ত নীরবে ধ্বজাধারী ধার্মিকদের তথা অন্তঃসারশূন্য ধর্মের মুখোশটি খুলে দিতে পেরেছেন। বাংলাদেশের নিম্নবর্গের মুসলমান জীবনে ধর্মের প্রতিবন্ধকতার দিকটি তুলে ধরে এবং প্রকৃত ধর্মের জয়গানের মধ্য দিয়েই উপন্যাসটির পরিসমাপ্তি হয়েছে।

১৩৫০-এর মন্বন্তর বাংলাদেশের জনমানসে কী গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল তার জীবন্ত ইতিহাস হয়ে উঠেছে আবু ইসহাকের ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’। উপন্যাসের একজায়গায় লেখক তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন -

“নারিক সিন্দাবাদের ঘাড়ের উপর এক দৈত্য চেপে বসেছিল। বাংলা তেরোশো পঞ্চাশ সালের ঘাড়েও তেমনি চেপে বসেছিল দুর্ভিক্ষ। হাত-পা শেকলে বাঁধা পরাধীন সে বুভুক্ষু তেরোশো পঞ্চাশের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে তার পরের আরো চারটি উত্তরাধিকারীর। কিন্তু দুর্ভিক্ষ আর ঘাড় থেকে নামেনি। ঘাড় বদল করেই চলছে একভাবে। হাত-পায়ের বন্ধনমুক্ত স্বাধীন তেরোশো পঞ্চাশে এসেও সে আকাল-দৈত্য তার নির্মম খেলা খেলছে। তাকে আর ঘাড় থেকে নামানো যায় না।”^{২৩}

দেশে চালের দাম বছরে কোনো সময়ই কুড়ি টাকার নীচে নামে না। ফাল্গুন মাস থেকে সে দর আরো উপরে ওঠে। ফলে হতভাগা জনসাধারণ কখনো একবেলা, কখনো সন্তান সমেত দু’বেলা আধপেটা খেয়ে দিন কাটাতে থাকে। জয়গুন উত্তর থেকে চাল কিনে এনে গ্রামে বিক্রি করে যা পায় এবং হাসু সারাদিন মোট বয়ে যা উপার্জন করে তাতে তাদের সংসারে দু’বেলা পেট ভরে খাবার জোটে না। শফীর মা’র সংসারের অবস্থাও একই রকম। দশ বাড়ী ভিক্ষে করে এনে কোনোক্রমে সে দিন গুজরান করে। দুর্ভিক্ষের দিনে জয়গুনের একটি সন্তান যেমন দুধের অভাবে মারা গেছে, তেমনি ভাবে মারা গেছে শফীর মারও কয়েকটি সন্তান। দুর্ভিক্ষের এই করাল গ্রাসের কথা উপন্যাসের অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রের কথাতোও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গদু প্রধান যখন এখনকার ছেলেরা খেতে পারে না বলে টিটকিরি দেয়, তখন প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয় লেদু মিঞার বাচনে। প্রধানকে উদ্দেশ্য করে সে বলে -

“তোমার গোলা ভরা ধান আছে। এক সেরের বদলে দুই সের খাইলেও তোমার গোলা ঠিক থাকব। কিন্তু আমি সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলাইয়া রুজি করি পাঁচ সিকা। এই ট্যাকা পেড়ে দিমু, কাপড়

পিন্দুম, না এর তন রাজার খাজনা দিমু? ঘরে পরিবার আছে। তিনডা বাচ্চা আছে। আমার পেড যদি তোমার মতন এক সের খাইতে চায়, তয় উপায়খান অইব কী? সারাদিন খাইট্যা সোয়া সের চাউল গামছায় বাইন্দ্যা ঘরে ফিরি। সাধে কী আর আইজ কাইলকার ছেঁড়ারা খাইতে পারে না, না, খাইতে পায় না, কও। মাইন্মের পেড ছোড অইয়া যাউক খোদার কাছে আরজ করি। বেবাকের পেডে মাজায় লাইগ্যা এক অউক। এক ছডাকের বেশী যেন খাইতে না অয়। এইডা অইলে আর আকাল অইব না দ্যাশে।”^{২৪}

সমবেত ভাবে অপরাপর বর যাত্রীরাও লেদু মিঞার কথাকে পূর্ণ সমর্থন করে। এইভাবে নিম্নবর্ণের মুসলমান জীবনে মন্বন্তর ও তার পরবর্তী অবস্থা কী প্রভাব ফেলেছিল কয়েকটি চিত্রেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আবু ইসহাকের ‘সূর্য-দীঘল বাড়ী’তে এসেছে দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রসঙ্গ এবং বাংলাদেশের নিম্নবর্ণের মুসলমান জনসমাজে তার প্রভাবের কথা। তখনো দেশ স্বাধীন হয়নি, জয়গুন উত্তরে চাল কিনতে যাবার পথে ট্রেনে জনাকয়েক ভদ্রলোকের কথাবার্তায় শুনেছে সে কথা। তাদের আলোচনায় জয়গুন শুনতে পায়, -

“দ্যাশ স্বাদীন অইব। আর দুকখু থাকব না কারুর, হুন্ছি আমি। স্বাদীন অইলে চাউলও হস্তা অইব। আগের মতো ট্যকায় দশ সের।”^{২৫}

দেশ স্বাধীন হবে, তাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ যে স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে সেই চিত্রই এখানে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। জয়গুনও মনে মনে আঁকতে থাকে স্বপ্নের বুনুনি -

“...আশা জাগে মনে - চাল সস্তা হবে, কারো কোনো কষ্ট থাকবে না।”^{২৬}

যথারীতি আসে প্রত্যাশিত দিন। ১৯৪৭ সালের ১৫-ই আগস্ট শুক্রবার ভারতবাসীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়। বর্তমান বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা দিনটিকে কেমন ভাবে উজ্জাপিত করেছিল উপন্যাসের একটি ক্ষুদ্র অংশে আছে সেই চিত্র -

“মানুষের বিরাট মিছিল চলছে শহরের রাস্তা দিয়ে। হিন্দু-মুসলমান ছেলে বুড়ো - সবাই আছে মিছিলে... মিছিল শহরের সমস্ত রাস্তা ঘোরে। চিৎকার করে জানায় স্বাধীনতার বার্তা।”^{২৭}

স্বাধীনতার উত্তেজনা এতটাই ছিল যে হাসুদের মতো নিরন্ন পরিবারকেও তা বশীভূত করে। হাসু মায়ের বানিয়ে দেওয়া পতাকাটি আমগাছের উঁচু ডালে বেঁধে দেয়। সকলে একসাথে চিৎকার করে বলে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’।

স্বাধীন দেশের কাছে মানুষের প্রথম ও প্রধান প্রত্যাশা ছিল যে, ভাত-কাপড়ের সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু তাদের সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। দেশ স্বাধীন হলেও অবস্থার যে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি সে কথা জানতে পারি মায়মুনের বিয়েতে আসা দুলার বাপ সোলেমান খাঁ-র একটি বক্তব্য থেকে। সে বলে,

“স্বাদীন যে অইল হের কোনো নমুনাই যে পাইলাম না আইজও। দিন দিন যে খারাপের দিগেই চলল। মওসুমের সময়ই চাইলের দর এত, শেষে না জানি কী অয়।”^{২৮}

চাল যেমন দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে, বস্ত্রও সেই রূপ। মানুষের পরিধেয় বস্ত্রের ভীষণ অভাব। সরকারী নায্য মূল্যের দ্বিগুন দিয়েও বস্ত্রের জোগান পাওয়া যায় না। স্বাধীন দেশের নাগরিকের মুখে তাই ঝড়ে পরে সেই হতাশার কথা -

“দুলার চাচা লোকমান বলে - কত আশা-ভস্মা আছিল। স্বাদীন অইলে ভাত কাপড় সাইয়া অইব। খাজনা মুকুব অইব। কিন্তু কই? বেবাক ফাঁটকি, বেবাক ফাঁটকি। আবার লেল গাড়ির ভাড়াও বাইড়া গেল।”^{২৯}

এইভাবে উপন্যাসের ছোটো পরিসরে কিন্তু প্লটের ঠাসা বুনুনিতে ঝকঝকে স্ফটিকের মতোই মনস্তত্ত্বের অনতি পরবর্তী সময় থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী কালীন সময়ে পূর্ব বাংলার মুসলমান জনজীবনের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

মনস্তত্ত্বের স্বাধীনতার পাশাপাশি এসেছে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রসঙ্গ। বাদ যায়নি কলকাতার দাঙ্গার কথাও। তবে প্রত্যক্ষ ভাবে নয়, সে সব প্রসঙ্গ এসেছে পরোক্ষ; কিছু চরিত্রের স্মৃতি চারণার মধ্য দিয়ে। যেমন, কোলকাতার দাঙ্গার কথা আমরা পাই রশীদ-গৃহিনীর কথায় –

“তখন কোলকাতায় দাঙ্গা। ছেলেটি একদিন তার সঙ্গে রাগ করে সামনের ভাত ফেলে বেড়িয়ে গেল রাস্তায়। আর ফিরল না-”^{৩০}

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কথা শোনা যায় হাসুর স্মৃতি চারণাতেও –

“রাস্তায় উঠেই সে চমকে ওঠে। চারদিক থেকে চিৎকারের ধ্বনি শোনা যায়। হিন্দু-মুসলমানে কাটাকাটি শুরু হল না ত!... গত বছর এমন দিনে মারামারি বেধেছিল। পনের দিন সে ঘরের বার হতে পারেনি। তিনদিন না খেয়ে কাটাতে হয়েছে।”^{৩১}

বিভিন্ন প্রান্তের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় ডাক্তার গৃহিনীর কথাতেও। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে হিন্দুদের মধ্যে যে দেশ ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় সে কথাও এসেছে উপন্যাসের স্বল্প পরিসরে। তবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা প্রসঙ্গে লেখকের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যায়, রমেশ ডাক্তারের একটি উক্তি। দেশত্যাগ না করার যুক্তিতে রমেশ ডাক্তার তার স্ত্রী-কে যা বলেছিল তা যেন লেখকেরই কণ্ঠস্বর। ডাক্তার তার গৃহিনীকে বলেছিল, –

“কতগুলো পশুর প্ররোচনায় যা হয়েছিল, তা আর হবে না দেখে নিয়ো। ভায়ের বুকে ছুরি বসিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না – সবাই বুঝতে পেরেছে। ভায়ের বুকের রক্তে যে করুণ অভিজ্ঞতা হল, হিন্দু-মুসলমানের মন থেকে তা সহজে মুছে যাবে না। আর যদি একান্ত মুছেই যায়, তবে বুঝব তার পেছনে কাজ করছে স্বার্থান্ধ হিংস্রতা।”^{৩২}

এইভাবে সমকালীন পরিস্থিতি তথা স্বাধীনতা উত্তর দেশভাগ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা নিম্নবর্ণের মানুষের মনে কী প্রভাব ফেলেছিল; আবু ইসহাক তারই সুদক্ষ কথাকার।

Reference:

১. ইসহাক, আবু, সূর্য-দীঘল বাড়ী, চতুর্থ মুদ্রণ- এপ্রিল ২০১২, চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, পৃ. ১০৩
২. ঐ, পৃ. ৬১
৩. ঐ, পৃ. ৯২
৪. ঐ, পৃ. ১২
৫. ঐ, পৃ. ১৪
৬. ঐ, পৃ. ১৫
৭. ঐ, পৃ. ২৭
৮. ঐ, পৃ. ৩৪
৯. ঐ, পৃ. ৩৫
১০. ঐ, পৃ. ৪৫
১১. ঐ, পৃ. ৬২
১২. ঐ, পৃ. ৪৫
১৩. ঐ, পৃ. ৪৭

୧୫. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୬୭
୧୬. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୧୧୦
୧୭. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୧୨୦
୧୮. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୧୨୭
୧୯. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୧୧୨
୨୦. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୯୮
୨୧. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୧୨୧
୨୨. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୧୨୨
୨୩. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୧୨୪
୨୪. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୧୧୮
୨୫. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୮୭
୨୬. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୨୨
୨୭. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୨୨
୨୮. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୭୦
୨୯. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୮୦
୩୦. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୮୦
୩୧. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୧୯
୩୨. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୭୦
୩୩. ଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ. ୧୦୮